নিউরিকা

সুদীপ্ত দাস

‘‘কি ব্যপার বল তো? আমি একের একের এক চিঠি দিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি যেন কেমন একেবারে indifferent মনে হচ্ছে!! শেষের চিঠি গুলোর উত্তরও তো দাও নি। তোমার পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নি? সব চিঠির উত্তর চাই কিন্তু, না হলে কেলেঙ্কারি বাধিয়ে দেব!!

শেষ তোমার সাথে দেখা হয়েছিল ছিয়াশি সালের তেইশে ফেব্রুয়ারী। আমার এখনও আছে, সেটা ছিল একটা রবিবার। আমরা বিলাসপুর থেকে ট্রেনে রওনা হলাম কলকাতায়। তুমি দাদুর সাথে স্টেশনে এসেছিলে। তোমার লাল ফ্রকটা, যেটা আমরা তোমাকে তোমার eigth birthday তে দিয়েছিলাম সেটা আমার খুব প্রিয় ছিল - সেটা তুমি পরে এসেছিলে। দেখ, ন বছর আগের কথা আমার কেমন সব মকে আছে। আসলে তখন না বুঝলেও আস্তে আস্তে আমি কখন যে তোমার প্রেমে পড়ে গেছি ঠিক মনে নেই। খুব সম্ভব আমি তখন ক্লাস টেনএ সবে উঠেছি। বন্ধুদের সাথে স্কুল পালিয়ে ‘দিল হ্যায় কি মানতা নেহি‘ বলে একটা সিনেমা দেখতে গেছিলাম। পকেটে তোমার চিঠিটা ছিল। পোষ্ট করা হয় নি। কি একটা করতে গিয়ে যেন চিঠিটা পকেট থেকে বেড়িয়ে এসেছিল। শান্তনু বলে আমার এক বন্ধু কুড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘‘কি রে দীপ, প্রেম ট্রেম করছিস নাকি?"। হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্নে একটু হক্চকিয়ে গেছিলাম। একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। বন্ধুরা একটু পেছনে লাগল। তারপর থেকেই কথাটা কেমন যেন মাথায় ঘুরতে লাগল। একদিন দিদিকে বলেই ফেললাম ব্যাপারটা। সব শুনে টুনে দিদি বলল, ‘‘হাঁদা, বুদ্ধু, অনেক আগে থেকেই তোর বোঝা উচিৎ ছিল হে তুই প্রেমে পড়েছিস"। আমি বললাম, ‘‘তুমি জানতে?"। দিদি বলল, ‘‘হ্যাঁ, অনেক দিন আগে থেকেই; বুম্বাদাও ব্যাপারটা জানে। প্রথম আমরা বুঝি যেদিন তোর ডেস্ক গোছাতে গিয়ে দেখলাম যে ওর সব গুলো চিঠি একেবারে তারিখ অনিযায়ী সাজানো আছে সুন্দর ভাবে। তোর স্কুলের সব জরুরী জিনিষগুলোও হেলায় পড়ে থাকে, আর চিঠি গুলো - .....। তখনই আমরা একটু একটু আঁচ করেছি - একেবারে সিওর হয়ে গেলাম যেদিন তোর ডায়েরী পড়ে দেখি প্রতি তিন চার লাইন পর পরই নিউরিকা নিউরিকা লেখা!!"। আমি বোকার মত বললাম, ‘‘কই, আমি তো বুঝি নি!!"। কানটা মুলে মাথায় আস্তে চাঁটি মেরে দিদি বলল, ‘‘তাই না হলে কি আর হঁদা গঙ্গারাম বলি?"।

ব্যস, সেই থেকে শুরু .....

যাকগে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। একটু অদ্ভুত লাগছে, তোমার শেষ চিঠিতে তুমি কিন্তু আমার ন বছর পর বিলাসপুরে যাবার ব্যাপারে কিছু লেখনি। ন বছর পর আমাদের দেখা হবে, কিন্তু তুমি সেই নিয়ে একটা কথাও বল নি। তুমি হঠাৎ করে কেমন যেন বদলে গেছ মনে হচ্ছে। প্লিস, আমার থেকে কিছু গোপন করো না। আমার মনে হচ্ছে কিছু একঠা ব্যাপার আছে, তুমি আমার কাছ থেকে লুকাচ্ছো। পরের চিঠিতে তুমি একটু স্পষ্ট করে সব গুছিয়ে বলো। অনেক কিছুই আমি তোমার শেষ চিঠিতে বুঝিনি!!

হ্যাঁ, আরেকটা কথা। দিদিকেও একটা চিঠি দিও। আমাকে খুব খেপাচ্ছে কয়েক দিন ধরে!!

আজ এখানেই থাক। শীঘ্রই উত্তর দেবে। না হলে কিন্তু ..... ।।

অনেক অনেক ভালোবাসা, আরও অনেক কিছু -
ইতি দীপ।।"

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠিটা অনেক ক্ষণ ধরে পড়লেন। হতাশা এবং উৎকণ্ঠা মেশানো একটা ভাব নিয়ে একটা ড্রয়ার খুললেন। একটা ফাইল বার করলেন। চিঠিটা রেখে দিলেন ফাইলের মধ্যে। ফাইলের উপরে লেখা আছে

সূর্য ডোবার গান গেয়ে যাও আমার দীপালিকা,
স্বপ্ন ভেঙে আবার ওঠো সুপ্ত নিউরিকা।।

অনেকগুলো চিঠি রাখা আছে ফাইলের মধ্যে। সবগুলোই দীপের দেওয়া। তা সব মিলিয়ে একশর উপরে তো হবেই। সেই ছিয়াশি সাল থেকে শুরু। প্রথম প্রথম পোষ্টকার্ড আসত, তারপর কখন যে রঙচঙে খাম হয়ে গেছে, ঠিক মনে নেই।

২

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনের প্রায় তিন চতুর্থাংশই কাটিয়ে দিয়েছেন বিলাসপুরের কাছে একটা মফস্বল জায়গায় ছোট্ট একটা ফার্ম হাউসে নিজের গবেষণা নিয়ে। ছোট বয়সে তিনি পড়াশুনো করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। গুরুদেবের শেষ কয়েক বছরের সান্নিধ্য এবং বাৎসল্য তিনি পেয়েছেন। সেই সান্নিধ্যের পরশ এখনও তাঁর সর্বত্র ছড়িয়ে। সাহিত্য তাঁর রক্তে, বিজ্ঞানমনস্বিতা তাঁর মননে এবং সুদূর প্রসারণ তাঁর কর্মে। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে, স্বাধিনতার কিছু পরে, তিনি গেছিলেন পশ্চিমের কিছু শহরে। তখন কোথায় কি হয়েছিল তা সঠিক কেউ জানে না। অকৃতদার ধ্রুবজ্যোতি যখন ফিরলেন দেশে কয়েক বছর বাদে তখন তিনি অনেক বদলে গেছেন। মা বাবাকে অনেক আগেই তিনি হারিয়েছিলেন। আত্মীয় স্বজানরাও তাঁর বিশেষ খেয়াল রাখত না। তাঁর জীবন ধারণের পদ্ধতি অনেকেরই ভালো লাগত না।

পৈতৃক কিছু সম্পত্তি, ভাইদের সাথে ঝগড়া ঝাটি করে, নিজের নামে করিয়ে, সেই টুকু মূলধন নিয়ে, আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিদায় নিয়ে চলে এলেন বিলাসপুরের কাছে ছোট একটা জায়গা - মালচ্খণ্ড্এ। একটা বাগান বাড়ি কিনে ফেললেন। আসেপাশে লোকজন অনেক কম, সকলেই খুব অনুসন্ধিৎসু নজর নিয়ে নতুন বাঙালী বাবুকে পর্যবেক্ষণ করত। কয়েকদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল ধ্রুবজ্যোতি বাবু ভুতের কারোবার করেন। কারণ শ্মশান থেকে ভালো সূত্রে খবর পাওয়া গেছে তিনি নাকি সদ্যমৃত বাচ্চাদের খুব চড়া দামে কিনে নেন। তাই তাঁর ব্যপারে প্রতিবেশীদের কৌতূহল কিছু কম ছিল না। তবে এগিয়ে এসে কেউ সখ্যতা পাতায়

নি। এমনই করে কেটে গেল বহু বছর। কত মৃত বাচ্চা যে তিনি কিনেছেন তার আর কেউ হিসেব রাখে না। ধ্রুবজ্যোতি বাবুর বাড়িটা ক্রমে বাচ্চাদের খাবারের সময়ে ব্যবহৃত হতে লাগল মা-দিদিমাদের কথায় - ভয় দেখানোর জন্য। বাচ্চারা খুব ভয় পেতে লাগল তাদের রূপকথার রাক্ষস ধ্রুবজ্যোতি বাবুকে। পড়াশুনা না করলে বলা হত - ''বাঙালী বাবুকে বেচে দেব'' আর তক্ষুণি বেড়ে যেত বাচ্চাদের বাবা-ভোলানো মনোযোগ। এই করেই বহু বছর কেটে গেল। ধ্রুবজ্যোতির বয়স বাড়তে লাগল। যে সব বাচ্চারা বাঙালী বাবুকে দেখেই ভয় পেত, তারাও বড় হয়ে গেল। তাদের বাচ্চাদেরও ভীতি প্রদর্শনের কেন্দ্রে সেই বৃদ্ধ বাঙালী বাবুই এসে হাজির হল। যুযুবুড়িদের যেমন বয়সের কোন গাছপাথর নেই - যে কোনো যুগেই তারা অমর হয়ে রয়েছে বাচ্চাদের কাছে খলনায়ক হয়ে - সেই রকমই ধ্রুবজ্যোতি বাবুও সেই অঞ্চলে কিছুটা অমরত্ব লাভ করলেন। সেই জায়গাটা, যেখানে তিনি তাঁর ফার্ম হাউসে কি সব সন্দেহ জনক কাজে লিপ্ত গত কয়েক শতক ধরে - তার নাম হয়ে গেল ''ভুত বাঙলা''। এক কথায়, বিলাসপুরে নেমে রিক্সা , ট্যাক্সী বা অন্য কোনো যানবাহনে সওয়ার হয়ে শুধু বলতে হবে, ''ভূত বাঙলা'' - ব্যাস, যাত্রী নিশ্চিন্তে পৌঁছে যাবে গন্তব্যস্থানে!!

হঠাৎ একদিন দেখা গেল ভূত বাংলার এলাকায় ছোটো ছোটো দুটো ছেলে মেয়ে খেলা করছে। লোকজনের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। সবাই আনাচ কানাচ থেকে উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করে দিল। গত কয়েক দশক ধরে অনেকে অনেক কিছু দেখেছে বা শুনেছে, কিন্তু দুটো ফুলের মত বাচ্চাকে খেলা করতে কেউ দেখে নি। বনবিহারী বলে স্থানীয় একটা ব্যাঙ্কের বেয়ারা বলল ছেলেটাকে নাকি তাদের নতুন ম্যানেজারের ছেলের মত দেখতে। তুরন্ত্ খবর পাঠানো হল প্রবীর সেনগুপ্তকে। তিনি ছুটে এসে আরও অবাক হয়ে গেলেন - হ্যাঁ, ছেলেটা তাঁরই - দীপ। খুব বকাবকি করে তিনি দীপকে প্রায় জোড় করেই নিয়ে আসছিলেন। গেট থেকে যখন প্রায় বেড়িয়েই এসেছেন - এমন সময় তাঁকে কেউ ডাকল, পিছে ফিরে দেখেন গেটের বেশ কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ - বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হবে, মাথার চুল কিছুটা সাদা, কিছুটা কালো - সাদা কালোর মেলাপে একটা স্বাভাবিক অভিনবত্ব আছে; চোখে একটা কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি, চেহারায় একটা উস্কো খুস্কো ভাব; পরনের সাদা ফতুয়া এবং সাদা পায়জামা অনেক দিনের নোংড়াতে ধূসর হয়ে গেছে, পায়ে একটা বিদীর্ণ স্যান্ডেল - বহু বছরের ব্যবহারের চিহ্ন তার স্ট্র্যাপে, ছেঁড়া সোলে; দেহের যেটুকু অংশে শিরা উপশিরাগুলো দৃশ্যমান, সেগুলো বড্ড প্রকট - তাই বার্ধক্য যেন একটু বেশী মাত্রায় চোখে লাগে, তবুও কোথাও যেন একটা সৌম্য ভাব মিশে আছে - চোখের চাহনি খুবই দৃপ্ত, গভীর; একহাতে একটা পাইপ ধরা, আর এক হাতে একটা যন্ত্র - টিভির রিমোট কন্ট্রোলারের মত।

- ওকে বকছেন কেন? আমার নাতনীর সাথে তো কেউ মেশে না, এই প্রথম ও একটা সাথী পেল, দয়া করে ওকে নিউরিকার সাথে খেলতে দিন।

বলতে বলতে তিনি এগিয়ে অসছিলেন প্রবীর সেনগুপ্তর কাছে। দীপও যেন একটু ভরসা পেয়ে বলল, ''বাবা, খেলিনা, রিকা খুব মিষ্টি মিষ্টি খেলা জানে।''

- অপনি আসুন না ভিতরে। বাঙালী তো আমি বহুদিন বাদে দেখলাম। আসুন না, ভেতরে আসুন।

- আমার একটু কাজ ছিল, অন্য কোন দিন না হয় আসবো।

- ঠিক আছে।

- দীপ, আজ চলে এসো, আর এরকম না বলে কখনও চলে আসবে না। আচ্ছা, আসি তাহলে, আর, হ্যাঁ, আপনার নামটা ত জানা হল না ...

- আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে বছর তিরিশেক ধরে গবেষণা করছি।

- কি নিয়ে?

- মানুষ নিয়ে।

- আপনি কি নৃ বিজ্ঞানী?

- না, তবে হ্যাঁ ও বলতে পারেন।

- মানে?

- আরেক দিন আসুন সময় করে, বুঝিয়ে বলব।

প্রবীর বাবু চলে এলেন বাড়িতে। ধ্রুবজ্যোতি নামটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল। অনেক ক্ষণ ভাবার চেষ্টা করলেন। তারপর নিজের জমানো খবরের কাগজের কাটিঙের সংগ্রহ গুলো নিয়ে বসলেন। ১৯৬২ থেকে তিনি সংগ্রহ করছেন। তার আগে করতেন তাঁর কাকা অপামর সেনগুপ্ত। ১৯৩০ থেকে প্রতিটি আকর্ষণীয় কাটিঙ রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। পঞ্চাশের দশকের সংগ্রহটা নিয়ে বসলেন তিনি। ৫১, ৫২র সব গুলো দেখা হল। তিপ্পান্নতে এসে পেয়ে গেলেন খবরটা - কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড ঃ ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক মৃত ব্যক্তিতে প্রাণ সঞ্চারণ করার এক প্রনালীর অবতারণা করেছেন। তবে বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিক তাঁর পন্থাকে মেনে নেন নি। কেবল উইলিয়াম ফ্রাঙ্ক নামে এক বয়স্ক বৈজ্ঞানিক তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজের সহকারী করেছেন।''

উইলিয়াম ফ্রাঙ্ক্ নামটাও প্রবীর বাবুর কাছে কিছুটা চেনা চেনা লাগছিল। আরো পুরোনো খবরের কাটিং দেখতে দেখতে বুঝে গেলেন রহস্যটা। ১৯৪২ এর কথা। কলকাতার এক কাগজে বেরিয়েছিল খবরটা - ''উইলিয়াম ফ্রাঙ্ক্ নামে এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাগারে মৃত ব্যক্তিতে প্রাণ সঞ্চারণ করার কাজে বহুদিন ধরে লিপ্ত''।

বুঝতে বাকি রইল না যে ধ্রুবজ্যোতি বাবু উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাজই করে চলেছেন নির্জন তাঁর গবেষণাগারে। এবারে তিনি ধ্রুবজ্যোতি বাবুর সম্বন্ধে প্রচলিত কথাগুলির মধ্যে একটা মানে খুঁজে পেলেন, বুঝলেন কেন তিনি শ্মশান থেকে মৃত বাচ্চাদের চড়া দাম দিয়ে কিনে নিতেন।

ঠিক করলেন সেদিনই বিকেলে দীপকে নিয়ে তিনি ধ্রুবজ্যোতি বাবুর সাথে দেখা করতে যাবেন।

প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর তিনি আসল কথায় চলে এলেন।

- আপনার সম্বন্ধে সব কিছু জানলাম।

- কি জানলেন?

- উইলিয়াম ফ্রাঙ্ক, কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় ....

- কি করে?

- আমার হবি আকর্ষণীয় খবরের কাটিং জমানো। আমার পুরোনো সংগ্রহ থেকে জানলাম। আপনার নামটা শোনা মাত্রই কেমন চেনা চেনা লাগছিল। একটু ঘাটাঘাটি করেই বেরিয়ে গেল।

- তবে সবটা জানতে পারেন নি।

- মানে?

- খবরে, যতদূর সম্ভব, বেরিয়েছিল আমি মৃত ব্যক্তিতে প্রাণ সঞ্চারণ করার কাজ করছি। হ্যাঁ, শুরুর দিকে তাই ছিল - তবে উইলিয়াম ফ্রাঙ্কের সাথে যোগাযোগ হওয়াতে আমার কাজের ধরণটা একটু বদলে যায়। বর্তমানে আমি যন্ত্র চালিত মানুষ বানানোর কাজে লিপ্ত আছি।

- You mean robot?

- হ্যাঁ, তবে very much like Human Being. রোবোটের মন থাকে না। আমার মানুষের মধ্যে মন থাকবে, ভালোবাসতে জানবে, হাসতে জানবে, কাঁদতে জানবে, চিন্তা করতে জানবে, সর্বোপরি দেখতে হবে হুবহু মানুষের মতন। আপনি হয়তো লোকজনের মুখে শুনেছেন যে আমি শ্মশান থেকে মৃত বাচ্চাদের চড়া দামে কিনে আনি। আসলে আমি নিজে হাতে হুবহু মানুষের অবয়ব বানাতে পারছিলাম না। তাই সত্যিকারের মানুষের খোলোসটা ব্যবহার করে এগোতে চেয়েছিলাম।

- আপনি কি মনে করেন যে আমনি সফল হবেন?

- হব মানে? হয়েছি প্রায়!! কিছু ফাইনাল টেস্টিং বাকি আছে। খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে আমার ত্রিশ বছরের সাধনা।

তারপর আরও কিছু অন্যান্য কথা বার্তার পর প্রবীর বাবু বললেন

- আজ আমরা তাহলে উঠি, দীপ, চল।

- দাঁড়াও বাবা, রিকার সাথে একটু দেখা করে আসি।

- তাড়াতাড়ি এস কিন্তু।

দীপ চলে গেলে প্রবীর বাবু জিজ্ঞেস করলেন

- আচ্ছা ধ্রুবজ্যোতি বাবু, নিউরিকা কি আপনার নিজের নাতনী?

একটু ইতস্তত করে ধ্রুবজ্যোতি বাবু বললেন -

- হ্যাঁ, আমার মেয়ে, সুতপা, যাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিল, হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। অনেক দিন থেকেই ওরা এক সাথে থাকত। ছেলেটা মারা যাবার সময় সুতপা গর্ভবতী ছিল। তারপর সন্তান প্রসব করার সময় সুতপাও মারা গেল। সেই থেকে নিউরিকা আমার কাছেই মানুষ।

- ওর দিদিমা....

- উনি অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন।

- আপনার মেয়ে কি এখানেই থাকত?

- না, হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করেছে। এখানে কোন দিনও আনি নি। এখানকার পরিবেশ ত আপনি দেখেছেন -

- এখন নিউরিকার বয়স কত?

- প্রায় দশ বছর।
- আচ্ছা নমস্কার, আজ আসি, দীপও এসে গেছে, চলি।
- আবার আসবেন। আর দীপকে পাঠিয়ে দেবেন নিউরিকার সাথে খেলা করতে।
- আচ্ছা।

বড়িতে এসে প্রবীর যেন একটু চিন্তায় পড়লেন। কয়েকটা জিনিষ তাঁর ভীষণ খট্‌কা লাগছে। প্রথমত লোকালয়ের লোকেরা নিউরিকা বলে মেয়েটাকে দশ বছরে একবারও দেখেছে বলে তো মনে হয় না। যেদিন দীপ প্রথম চলে গেছিল ধ্রবজ্যোতি বাবুর বাড়িতে সে দিনই সবাই জানল যে ভূত বাংলাতে একটা বাচ্চা মেয়েও আছে।

দ্বিতীয়ত, ধ্রুবজ্যোতি বাবুর ঘরে তাঁর মৃতা স্ত্রী বা মেয়ের কোন ছবি চোখে পড়ল না। আর সুতপা সব সময় হস্টেলে থাকত, এটাও কেমন যেন একটু বিশ্বাস করতে বাধছে।

- কি বাবা, কি অত ভাবছ? - প্রবীরের মেয়ে রিনা।

প্রবীর বললেন সব কিছু। রিনাও কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল -

- বাবা তোমার পুরো খট্‌কাটা ত অমূলকও হতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের ত অনেক অদ্ভূত ব্যপার থাকে। ঘরে মৃতা স্ত্রী বা মেয়ের ছবি না লাগানোটা কি এমন অদ্ভূত? সত্যেন বসু তো একবার সিনেমা হলে স্ত্রীকে বসিয়ে রেখে টিকিট আনতে এসে ছাত্রদের সাথে গবেষণাগারে ঢুকে পড়েছিলেন। ওনার স্ত্রী অপেক্ষা করতে করতে শেষে অধৈর্য হয়ে ফিরে গেছিলেন।

- আর নিউরিকাকে কেউ গত দশ বছরে কেউ দেখল না কেন?

- হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ভাববার বিষয়!!

প্রবীরের খটকাটা ক্রমে নতুন জায়গায় কাজের চাপে হারিয়ে গেল। দীপও প্রায় রোজই যেত নিউরিকার সাথে খেলা করতে। মাঝে মাঝে রিনাও যেত ভাইয়ের সাথে। দীপের সাথে নিউরিকার খুবই ভাব হয়ে গেছিল। তারপর দেড় বছর পরে প্রবীর বদলি হলেন কলকাতায়। ওঁরা বিলাসপুর স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেনে উঠলেন তেইশে ফেব্রুয়ারী, ছিয়াশি সালে। ন বছর পেরিয়ে গেল।

৩

দীপের চিঠিটা ফাইলে রাখতে রাখতে বিগত তিরিশ চল্লিশ বছরের ছায়াচিত্র ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের সামনে একে একে উদ্ভাসিত হল। তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর একটা সাদা পাতা নিয়ে লিখতে শুরু করলেন -

স্নেহের দীপ,

তোমার শেষ চিঠিটাও পেয়েছি। অন্য সব গুলোর মত এটাও আমি যত্ন করে একটা ফাইলে রেখে দিয়েছি। আমার গবেষণার এর থেকে ভালো সার্টিফিকেট আর কিছু হতে পারে না। নিউরিকা, যাকে তুমি ভালোবাসো, সে আসলে আমার তিরিশ বছরের সাধনার ফল। কি নিঁখুত ভাবেই না বানিয়েছিলাম আমার মানস কন্যা নিউরিকাকে। কিন্তু ভগবানের সাথে পাল্লা দিতে

পারলাম কই? তোমরা বিলাসপুর ছেড়ে চলে যাবার কিছু দিনের মধ্যেই যান্ত্রিক গোলযোগে নিউরিকা শেষ হয়ে যায়। আর কোন দিনও আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি নি। কিন্তু তোমার শিষু মনকে আমি কি বোঝাতাম? তাই প্রথম প্রথম আমিই তোমার চিঠির উত্তর দিতাম। ভেবেছিলাম পরে হয়ত কখন তোমাকে সত্যি কথাটা জানাবো। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে নি। গত ন বছর ধরে সব চিঠি আমিই তোমাকে লিখে এসেছি। আজ আর তোমাকে অন্ধকারে রাখা যাবে না। আমি নিউরিকার নকল মন গড়তে গিয়ে তোমার আসল মন ভাঙতে পারব না। আমাকে ক্ষমা কর।

এখন আরেকটা নিউরিকা বানিয়েছি। তবে তাতে মন দিই নি। বেশী করে মাথা দিয়েছি। বিজ্ঞানে সবই হয়। শুধু মন গড়া শক্ত। সেখানেই ভগবান আমাদের টেক্কা দিয়েছেন!!

ইতি

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

খড়গপুর

১৬/৭/১৯৯৫